স্কুলব্যাগের চাপে সন্তান হারাতে চাই না

মোস্তাফা জব্বার

খবরটি বাংলাদেশের অনেকগুলো নিউজপোর্টালেও প্রকাশ হয়েছে। ছোট এই খবরটি একটি পোর্টাল থেকে তুলে ধরছি। গত ৬ এপ্রিল ২০১৬ বাংলা মেইল২৪ডটকম পোর্টালের খবর হচ্ছে– 'পিঠে ভারি স্কুলব্যাগ নিয়ে নিচে তাকাতে গিয়ে পাঁচতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে চার বছরের এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। শিশুটির নাম সারিকা সিং। ভারতের মহারাষ্ট্রের নালাসোপারা ইস্টের অলকাপুরী এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, শিশু সারিকা সিং স্কুল থেকে ফিরে নিজের ফ্ল্যাটে যাচ্ছিল। সেই সময় কেউ তার নাম ধরে ডাক দেয়। তারপরই সারিকা ব্যালকনি থেকে নিচের দিকে তাকায়। কিন্তু ভারি স্কুলব্যাগের ওজনে টাল সামলাতে না পেরে সে পাঁচতলা থেকে পড়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এদিকে পুলিশের ধারণা, ভারি ব্যাগের জন্যই ঝুঁকতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশুটি পড়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু চার বছরের শিশুর পিঠে কি এত বইয়ের বোঝা চাপানো উচিত? দুর্ঘটনার পর এই প্রশ্ন আরও একবার সবার মুখে মুখে।'

দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা এমন হতেই পারে। কিন্তু এই ঘটনাটির মর্মার্থ একটু ভিন্নভাবে তাকিয়ে দেখা যায়। অনুভব করা যায়, কোনোভাবেই শিশুকে তার বিশাল ওজনের ব্যাগটি থেকে মুক্তি দেয়া যায় কি না।

বাংলাদেশের পোর্টালে প্রকাশিত এই খবরটির উৎস্য খুঁজতে আমরা গুগল থেকে 'ইন্ডিয়াটিভি নিউজ' খুজে পাই, যেখানে বলা হয়– সারিকা পাঁচতলায় অবস্থিত তাদের বাসায় যাওয়ার আগে চারতলায় তার প্রতিবেশীর তলায় থামে। পরে যখন সে তার নিজের বাসায় উঠতে যায় তখন সে সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নিচে কারা আছে তা দেখতে তাকালে সে তার শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এই ভারসাম্য হারানোর প্রধানতম কারণ হচ্ছে তার ভারি স্কুলব্যাগটি। ফলে সে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। এর পরপরই আতঙ্কিত বাসিন্দারা তাকে প্রথমে অ্যালিয়েন্স হাসপাতালে ও পরে ককিলাবেন আম্বানি হাসপাতালে নিয়ে যান, যেখানে সে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সারিকার বাবা দারা সিং রাজরিয়া তখন বাসায় ছিলেন না। তিনি কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। তুলিঞ্জ পুলিশ স্টেশনের সহকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদর্শন পোদ্দার জানান, সারিকার দুটি বড় বোন ও একটি বড় ভাই রয়েছে। তাদের ফ্ল্যাট নাম্বার হচ্ছে ৪০৫। এলাকার বাসিন্দারা সারিকার মৃত্যুতে শোকার্ত। কারণ সে সবার আদরের ছিল।

www.indiatvnews.com/news/india-four-year-old-girl-in-mumbai-falls-to-death-from-4th-floor-due-to-heavy-school-bag-322368

সেখানেই মেয়েটির ছবিও পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অনেকেই তাদের খবরের সাথে নিজেদের ছবি বা শুধু স্কুলব্যাগের ছবি প্রকাশ করেছেন। চার বছরের নিষ্পাপ এই মেয়েটি বস্তুত সারা দুনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার দিকেই আঙুল তুলেছে। বিশ্বজুড়ে শিশুশ্রেণি থেকে ওপরের দিকে পড়তে যাওয়া সব শিশুর জন্যই এমন ভারি স্কুলব্যাগ ব্যবহার করা হয়। শিশুর শারীরিক ওজন যাই হোক না কেন, তাকে কখনও কখনও তার নিজের শরীরের ওজনের তুলনায় বেশি ওজনের ব্যাগ বহন করতে হয়।

বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুলব্যাগ ব্যবহার করে বিশেষ করে শিশুদেরকে যেভাবে নিপীড়ন করা হয়, তার বিপরীতে কীভাবে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা এর বিকল্প হতে পারে, সেই বিষয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে। এর আগে বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক আলোচনাও করেছি। বাংলাদেশে শিক্ষাকে

ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে কী ধরনের দুর্বলতা বিরাজ করে, সেটিও ব্যাপকভাবেই আলোচনা করেছি। স্কুলব্যাগের ওজন ও সেটি বহন করার বিষয়ে বাংলাদেশে প্রকাশিত একটি খবরকে কেন্দ্র করে আমার আলোচনাটি ছিল এর বিদ্যমান অবস্থা এবং আমাদের সরকারি প্রয়াস নিয়ে। আমরা প্রসঙ্গত একটু পেছনের দিকেও তাকাতে পারি।

'২০১৪ সালের নভেম্বরে ঢাকার জাতীয় একটি দৈনিক পত্রিকায় একটি শীর্ষ সংবাদ পরিবেশন করা হয়, যাতে বলা হয়, আমাদের শিশুদের স্কুলব্যাগটা বড্ড ভারি। তারা জরিপ করে দেখিয়েছে, ১৫-২০ কেজি ওজনের শিশুকে ৬ থেকে ৮ কেজি ওজনের স্কুলব্যাগ বহন করতে হয়। তারাই ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে বলেছে, শিশুর মোট ওজনের শতকরা ১০ ভাগের বেশি ওজনের ব্যাগ তার কাঁধে দেয়া উচিত নয়। এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হতে পারে।'

আমরা এখন জানি স্কুলব্যাগের ওজন শুধু সমস্যা তৈরি করে না। ভারতের শিশু সারিকার মৃত্যু শারীরিক সমস্যার বাইরে জীবন সমাপ্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

তারা নানা পরামর্শ দিয়ে বলেছে, শিশুর বই কমিয়ে, স্কুলে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে, খাতার পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে ব্যাগের ওজন কমানো যায়। প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এসব চিন্তাভাবনা নিয়ে সামনে এগোনো যেতে পারে। কিন্তু কার্যত শিশুদের বইয়ের ওজন, খাতার ওজন বা পানির বোতল কোনোটাই কমবে না। বরং যদি ব্যাগটির ওজন আরও বাড়ে, তবে তাতে আমাদের অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ফলে ব্যাগের ওজন বাড়ার এই সমস্যার সমাধানও তাই পাঠক্রম কমানোতে বা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার পথে হবে না। আসুন অন্য কিছু ভাবি। এর বিকল্প কী হতে পারে, সেটি নিয়ে চিন্তা করি। এই ভাবনাটি অবশ্য আমার জন্য একেবারেই নতুন নয়।

আমি স্মরণ করতে পারি, নব্বই দশকেও আমার সম্পাদিত নিপুণ পত্রিকায় শিশুদের ওজনদার স্কুলব্যাগের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলাম। আমার শিশুকন্যা তন্বীর পিঠের ব্যাগটিকে প্রচ্ছদের ছবি বানিয়ে তার ওপরই প্রচ্ছদ কাহিনী করেছিলাম। তখনই প্রস্তাব করেছিলাম– শিশুদেরকে যেন তথাকথিত বিদ্যার ওজনে পিষ্ট না করা হয়। তখনও দুনিয়া জুড়ে ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার তেমনভাবে শুরু হয়নি। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লাসরুমে কমপিউটার প্রচলনের সূচনা হয়েছিল। আমরা ঢাকায় তখনও ভাবতেই পারিনি বইয়ের কোনো বিকল্প হতে পারে। সেজন্য তখন আমি বিষয়টি মানবিক বিবেচনায় দেখার অনুরোধ করেছিলাম। ▶

শিশুদেরকে যে বইয়ের বোঝা দেয়া উচিত নয়, সেসব কথা সরকারের নীতি-নির্ধারকেরা হরহামেশাই বলে থাকেন। সরকারিভাবেও পাঠক্রম পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু দিনে দিনে বই ও বিষয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বৈষম্যটা কেমন তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিশুরা পড়ে মাত্র তিনটি বিষয়। পঞ্চম শ্রেণিতে শিশুরা পড়ে ছয়টি বিষয়। সেই শিশু ষষ্ঠ শেণিতে পড়ে ১৩টি বিষয়। যারা এসব বিষয় পাঠ্য করে তারা কি কখনও ভাবে শিশুটির মেরুদণ্ডের জোর কতটা? এটিও কি তারা বুঝেন, এক বছরে সে কতটা বেশি গ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জন করে? এক বছরের ব্যবধানে একটি শিশুকে কি কোনোভাবে নতুন সাতটি বিষয় পড়তে দেয়া যায়? দুনিয়ার কোনো শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কি এমন পরামর্শ দিতে পারেন? দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের পণ্ডিতরা সেই কাজটি করেছেন। শুধু কি তাই, পাঠক্রমে যে পরিমাণ বই বা পাঠক্রম আছে বেসরকারি বা ইংরেজি মাধ্যম এমনকি মাদ্রাসারও বই বা পাঠক্রম তারচেয়ে বহুগুণ বেশি। আমরা লক্ষ করেছি, কোনো কোনো বাংলাদেশের উচ্চ আদালতে রিট করেছেন এবং আদালত শরীরের ওজনের এক-দশমাংশের বেশি ওজনের ব্যাগ শিশুদেরকে না দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ কতটা কার্যকর হবে, সেটি নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এর প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী বই কমানোর কথা বলেছেন। কিন্তু বই কমানোটা যে তার এখতিয়ারে নেই, তার ধারণা আমরা পাই যখন দেখি সরকার পুরো শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণই করে না। শুধু অননুমোদিত স্কুল নয়, পাঠক্রম নিয়ন্ত্রণও সরকারের নিয়ন্ত্রণে নয়।

আমি মনে করি, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বইয়ের সংখ্যা কমানো গেলেও স্কুলব্যাগের ওজন কমানোটা ডিজিটাল যুগের সমাধান নয়। বরং এখন দুনিয়ার সর্বত্র স্কুলব্যাগ উধাও করার প্রচেষ্টা চলছে। আমরা নিশ্চিত করেই জানি, ডেনমার্কের স্কুলে বই দিয়ে লেখাপড়া করানো হয় না। আমরা ডেনমার্কের শিশুদের জন্য সফটওয়্যার বানাতে গিয়ে দেখেছি, ওরা ওদের হাতে প্যাড ব ট্যাব তুলে দিয়েছে। সিঙ্গাপুরের ছেলেমেয়েরা আইপ্যাড দিয়ে পড়াশোনা করে। মালয়েশিয়ার

বেসরকারি বিদ্যালয়ে এনসিটিবির বইয়ের চেয়ে শিশুশ্রেণিতেই দ্বিগুণ-তিনগুণ বই পড়ানো হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকে শুধু বই থেকে কমিশন পাওয়া যাবে বলে নতুন নতুন বই পাঠ্য করে। প্রকাশকেরা এসব বই পাঠ্য করার জন্য শতকরা ৭০ ভাগ অবধি কমিশন দিয়ে থাকে। অন্যদিকে স্কুলের মালিক ও শিক্ষকেরা বলেন, অভিভাবকেরাই চান যেন অনেক বই পাঠ্য করা হয়। একটি বিষয়কে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। সরকার দ্বিতীয় শ্রেণিতে ইংরেজি শেখার জন্য একটি বই পাঠ্য করেছে। কিন্তু বেসরকারি স্কুলে ইংরেজির ওয়ার্ড বুক, অ্যাকটিভ ইংলিশ এমনকি ব্যাকরণও পাঠ্য করে। শিশুশ্রেণির একটি শিশুর যেখানে খেলায় খেলায় পড়ার কথা, সেখানে তাকে বইয়ের পর বই চাপিয়ে দেয়া হয়। শিশুর জন্য একসাথে বাংলা-ইংরেজি ও আরবি ভাষার অত্যাচার তো আছেই, কাকতালীয়ভাবে সেজন্য সরকারি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ সরকারি স্কুলের চেয়ে বেশি বই পাঠ করে। মুম্বাইয়ের ঘটনাটি বাংলাদেশেও ঢেউ তুলেছে। কেউ একজন স্মার্ট স্কুলগুলোতে কাগজের বই কোনো প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গই নয়। যুক্তরাজ্যের স্কুলগুলো সম্পর্কে ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটির অংশবিশেষ দেখেই বলা যাবে, ওজন কমানো নয়, ভারি ওজনের স্কুলব্যাগটিকে উধাও করাটাই সমাধান।

খবরটির শিরোনাম– যুক্তরাজ্যের ৭০ শতাংশ বিদ্যালয়ে ট্যাবলেট। খবরটি এরকম– 'যুক্তরাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ট্যাবলেট কমপিউটার। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নতুন প্রযুক্তির সুবিধা দিতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির সুবিধা নিতে ট্যাবলেট কমপিউটার ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাজ্য। আর সে জন্যই বিদ্যালয়গুলোতে ট্যাবলেট কমপিউটার দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে। গবেষণার অংশ হিসেবে ৬৭১টি বিদ্যালয়ে জরিপ চালানো হয়। বিদ্যালয়গুলোতে ট্যাবলেটের এমন ব্যবহার বাড়ার ফলে প্রযুক্তির প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাসা এবং বিদ্যালয়ে প্রযুক্তির নানা সুবিধাও ব্যবহার করছে শিক্ষার্থীরা। বার্বি ক্লাক অব দ্য ফ্যামিলি, কিডস অ্যান্ড ইয়ুথ রিসার্চ গ্রুপের করা এ গবেষণায় বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের ৬৮ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৬৯ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ট্যাবলেট কমপিউটার ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি ট্যাবলেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যালয়ের বাইরে বাসায় প্রায় ৭০ শতাংশ তরুণ শিক্ষার্থী ট্যাবলেট কমপিউটার ব্যবহার করে। শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট ব্যবহারের এমন হার ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বেশ সহায়তা করছে বলে জানিয়েছে গবেষক দল। যে হারে এ সংখ্যা বাড়ছে তাতে ২০১৬ সালের মধ্যে ট্যাবলেট ব্যবহারের সংখ্যা বেড়ে হবে ৯ লাখ। চলতি বছরে এ সংখ্যা হলো ৪ লাখ ৩০ হাজার।' যুক্তরাজ্যের শিশুদের এই পরিসংখ্যান বস্তুত একটি ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত দিকনির্দেশনা প্রদান করছে।

ফোর্বসের ওয়েবসাইটে ডিজিটাল শিক্ষা নিয়ে অসাধারণ কিছু মন্তব্য পাওয়া গেছে। একটি মন্তব্য হচ্ছে– ৬০০ বছর আগে জার্মানির গুটেনবার্গ ছাপাখানা আবিষ্কার করে যে ধরনের বিপ্লব সাধন করেছিলেন, শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর দুনিয়াটিকে সেভাবেই বদলে দেবে। এতেই বলা হয়, ডিজিটাল শিক্ষা এখন আর ডিজিটাল ক্লাসরুমে স্মার্ট বোর্ড, শিক্ষামূলক খেলা বা ক্লাসরুমের রূপান্তরই নয়, বরং যেসব শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগের বাইরে তাদের জন্যও এক অনন্য সুযোগ হতে পারে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশে আমরা কি স্কুলব্যাগটা গায়েব করার মতো অবস্থায় রয়েছি? বিষয়টি আমার মাথায় বহুদিন ধরে কাজ করছে বলে এর পরীক্ষা করার বিষয়টাও আমার মাথায় ছিল। আমি সেজন্য ২০১৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর নেত্রকোনার পূর্বধলার আরবান একাডেমির প্রথম শ্রেণির ৩৯ জন শিশুর হাতে আট ইঞ্চি আকারের ৫০০ গ্রাম ওজনের ট্যাব তুলে দিয়েছি। ওরা তাদের পাঠ্যবই সেই ট্যাবেই পায়। স্কুলব্যাগটাতে ভারি ওজনের বই তাদের বহন করতে হয় না। এক বছরের শেষ প্রান্তে ২০১৬ সালের নভেম্বরে আমরা স্কুলটির কর্তৃপক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদন পেলাম। সেটি থেকে ধারণা নেয়া যেতে পারে, আমরা ব্যাগ ও কাগজবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে পারছি কি না।

'প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক শিক্ষায় জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে ২০১১ সালে নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলায় সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরবান একাডেমি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের অংশ হিসেবে শুরু থেকেই আরবান একাডেমি সরকার নির্ধারিত কারিকুলামের পাশাপাশি প্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ যেমন প্রজেক্টর ও শিক্ষামূলক কনটেন্ট ব্যবহার করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ হিসেবে বিজয় ডিজিটালের সার্বিক ▸

তত্ত্বাবধান ও কারিগরি সহায়তায় আরবান একাডেমি ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দেয় শিক্ষার অন্যতম আধুনিক উপকরণ মিনি ল্যাপটপ বা ট্যাব। প্রথম শ্রেণিতে বিজয় ডিজিটালের বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট বিজয় প্রাথমিক শিক্ষা-১-এর সহায়তায় ক্লাস পরিচালনা করা হয়ে থাকে। ক্লাসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে রয়েছে কনটেন্টসমৃদ্ধ মিনি ল্যাপটপ ও কনটেন্ট উপস্থাপনায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের ৪০ ইঞ্চি মনিটর।'

প্রাথমিক শিক্ষায় পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ক্লাসরুম আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্রচলিত ও গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ভিন্ন আঙ্গিকে এটা বাস্তবায়ন যেমন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্দোলিত এবং উৎসাহিত করে, ঠিক তেমনি এর সফল বাস্তবায়নেও রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ। আরবান একাডেমির প্রথম শ্রেণির ডিজিটাল ক্লাস পরিচালনার ফলে সবল দিক ও চ্যালেঞ্জগুলো পর্যালোচনা করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো।

ডিজিটাল শিক্ষার ইতিবাচক দিক : আরবান একাডেমি নিজস্ব উদ্যোগে প্রথম শ্রেণিতে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ক্লাস চালুর ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বেশ কিছু সুবিধার ক্ষেত্র তৈরি হয়, যা শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ডিজিটাল ক্লাস পরিচালনার অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন পর্যায়ে এর সবল দিকগুলো এখানে উপস্থাপন করা হলো।

শিক্ষার্থী পর্যায়ে : ০১. অডিও এবং ভিডিও কার্টুন/অ্যানিমেশনসমৃদ্ধ কনটেন্টের সহায়তায় পাঠ উপস্থাপনের ফলে প্রত্যেকটি ক্লাস শিক্ষার্থীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়, যাতে করে শিক্ষার্থীরা পাঠে অধিকতর মনোযোগী হচ্ছে। ০২. বিভিন্ন ধরনের মজাদার কনটেন্টের সহায়তায় পাঠ উপস্থাপন করায় ডিজিটাল ক্লাসে উপস্থিতি সাধারণ ক্লাসের চেয়ে অনেক বেশি হয়। ০৩. শিক্ষার্থীরা সহজেই প্রাথমিক পর্যায়ের সাধারণ উপকরণ বিষয়ে ধারণা ও ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। ০৪. প্রাথমিক স্তরেই শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিভীতি কমে যাচ্ছে। ০৫. সহজেই শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিবিষয়ক নিত্যনতুন ধারণা লাভ করতে পারছে। ০৬. সহজবোধ্য কনটেন্টের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা অল্প সময়েই পাঠ আয়ত্ত করতে পারে। ০৭. শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলে শ্রেণিকক্ষে সব সময় এক আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করে। ০৮. শিক্ষার্থীদের সহজেই বাড়ির কাজ, সুন্দর হাতের লেখা ও অন্যান্য সহপাঠ ক্রমিক কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। ০৯. সহজেই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন। ১০. স্বল্প সময়েই শিক্ষার্থীদের বর্ণ ও শব্দের সঠিক উচ্চারণ এবং শুদ্ধ ভাষায় কথা বলানো-শেখানো যায়। ১১. শিক্ষার্থীদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বাড়ে। ১২. সমভাবে ও অল্পসময়ে পাঠ/বিষয়বস্তু সব শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে যায়। ১৩. শিক্ষার্থীরা নিজেদের মূল্যায়ন নিজেরাই করতে পারে। ১৪. শিক্ষার্থীরা ভিশনারি হচ্ছে। ১৫. সাধারণ ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিক্ষার্থীরা অধিকতর মানসম্পন্ন শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। ১৬. সাধারণ শিক্ষার্থীরাও অল্প সময়ে জড়তাহীনভাবে পাঠ গ্রহণে মনোযোগী হচ্ছে। ১৭. সব কারিকুলাম সহজে বহনযোগ্য। ১৮. শ্রেণি উপযোগী প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শিক্ষামূলক কনটেন্ট সংগ্রহে রাখা যাচ্ছে। ১৯. ছোট ছোট ইংরেজি শব্দ বলার অভ্যাস বাড়ছে। ২০. শিক্ষামূলক গেমসের মাধ্যমে মেধা বিকাশের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ২১. অপ্রয়োজনীয় ও বিপথগামী হতে পারে এমন গেমস থেকে শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে রাখার অভ্যাস গড়ে উঠছে।

শিক্ষক পর্যায়ে : ০১. শিক্ষক সহজেই বিষয়বস্তু সব শিক্ষার্থীর কাছে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। ০২. শিক্ষকরা অধিকহারে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিয়ে ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন। ০৩. শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারেন। ০৪. সমভাবে ও অল্পসময়ে পাঠ/বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মাঝে পৌঁছানো যায়। ০৫. শিক্ষকদের পাঠ উপস্থাপনা সহজতর হয়। ০৬. মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট শিক্ষকের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ০৭. অল্প সময়ে সব শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায়। ০৮. শ্রেণি উপযোগী অতিরিক্ত শিক্ষামূলক কনটেন্ট সংগ্রহে রাখা যায়। ০৯. পর্যাপ্ত কো-কারিকুলাম/ সহপাঠক্রমিক ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ১০. শিক্ষক শ্রেণি উপযোগী কনটেন্ট তৈরি করতে পারেন। ১১. সহজেই ক্লাসের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন। ১২. নিত্যনতুন আপডেটেট বিষয়গুলো সহজেই সংগ্রহ করতে পারেন। ১৩. শিক্ষক প্রতিনিয়ত নিজেকে প্রশিক্ষিত করার সুযোগ পান। ১৪. ই-বুক ও ই-কনটেন্ট ব্যবহারে শিক্ষকদের পারদর্শিতা বাড়ে এবং নিজেরাও ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে আগ্রহী হন।

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে : ০১. প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থী নিজ নিজ পাঠে অধিকতর মনোযোগী হচ্ছে। ০২. প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষালাভের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ০৩. প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়ছে। ০৫. বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শকের আগমনের ফলে নিত্যনতুন ধারণা লাভের সুযোগ বাড়ছে। ০৬. সংশ্লিষ্টজনদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি অধিকতর আস্থার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। ০৭. প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষার্থী ও কমিউনিটিতে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। ০৮. আরবান একাডেমিকে সার্বিক বিবেচনায় একটি মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ০৯. স্থানীয় কমিউনিটিতে প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। ১০. প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর পরিসরে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ডিজিটাল স্কুল পরিচালনার চ্যালেঞ্জগুলো : দীর্ঘদিন ধরে বই-খাতানির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধারার শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন বাস্তবিক পক্ষেই কষ্টসাধ্য। আরবান একাডেমি একেবারেই বেসরকারি উদ্যোগে প্রথম শ্রেণিতে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ক্লাস পরিচালনার অভিজ্ঞতার আলোকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে, তা এখানে উপস্থাপন করা হলো। ০১. সার্বিক কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন ব্যয়বহুল। ০২. ডিজিটাল ক্লাস উপযোগী দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সঙ্কট। ০৩. ডিজিটাল শিক্ষা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন না থাকা সমস্যার তৈরি করে। ০৪. নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা না থাকায় উপকরণ ব্যবহারে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ০৫. প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমে অভিভাবক পর্যায়ে সঠিক ধারণার অস্পষ্টতা রয়েছে। ০৬. শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট সব মহলে স্বচ্ছ ধারণা ও দক্ষতার অভাব আছে। ০৭. উপকরণ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। ০৮. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবান্ধব প্রয়োজনীয় কনটেন্টের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। ০৯. শিক্ষার্থীদের পারিবারিক পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাযথ সহযোগিতা করা হয় না। ১০. ডিজিটাল ক্লাস বাস্তবায়নে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অপর্যাপ্ততা রয়েছে। ১১. সার্বিক বিবেচনায় ডিজিটাল ক্লাসবান্ধব প্রশাসনিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। ১২. প্রাথমিক শিক্ষায় তেমনভাবে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত না থাকায় অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ কম।

তবে এই কথাটি মনে রাখা দরকার, বিশ্বায়নের বর্তমান এই সময়ে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ডিজিটাল ক্লাস পরিচালনা বাস্তবিক পক্ষেই সময়োপযোগী। দেশে সর্বক্ষেত্রে ডিজিটাল সেবার যে প্রসার ও অগ্রগতি, তা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অবকাঠামোগত সুবিধা ও অন্যান্য প্রস্তুতি বিবেচনায় ডিজিটাল শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে সঠিক পথে অগ্রসর হয়ে আরবান একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রথম শ্রেণির পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ক্লাসরুম শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় এটা নিঃসন্দেহে এক নবদিগন্তের সূচনা করবে।

পূর্বধলার এই অভিজ্ঞতার আরও প্রতিফলন ঘটানো হচ্ছে। চট্টগ্রামের ন্যাশনাল প্রাইমারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ১০০ শিশুর হাতেও ট্যাব দেয়া হয়েছে। আরও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাগজবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুলগুলোতে ট্যাব দিয়ে শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একটি পরিক্ষামূলক উদ্যোগের কথা আমি এখানে উল্লেখ করতে পারি। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬০০০ শিশুর হাতে বিজয়ের শিক্ষামূলক সফটওয়্যারসহ ট্যাব দেয়ার একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৭ সালে বাস্তবায়িত হতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী ২০১৭ সালে ষষ্ঠ শ্রেণির সবার হাতে ট্যাব দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আমি জানি না শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণা কবে কীভাবে বাস্তবায়িত হবে। সরকারের এমন কোনো প্রচেষ্টার নমুনা আমার হাতে নেই। কোনো উদ্যোগও দৃশ্যমান নয়। তবে আমরা প্রত্যাশা করি– কাগজ ও ব্যাগবিহীন ডিজিটাল শিক্ষা প্রচলিত শিক্ষাকে সহসাই স্থলাভিষিক্ত করবে কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com